26

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ও শিক্ষকদের রাজনীতি

দিতে হয়। কারণ তিনি শুধু সিনেট দ্বারা নির্বাচিত হলেই হবে না, তার নিযুক্তির চূড়ান্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে। সুতরাং পুনরায় নির্বাচনের জন্য একদিকে তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমন্ডলী এবং অন্যদিকে সরকার দু'পক্ষকেই খুশি রাখতে হয়। সরকারের কাছ থেকে নিযুক্তি পাবার জন্য ন্যক্কারজনক ধরাধরির ঘটনাও খুব দুর্লভ নয়। রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট নির্বাচনের ব্যবস্থা অনেক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে। এটি উপাচার্য নির্বাচনের সবচাইতে ত্রুটিযুক্ত দিক।

এসব ঘটনাই সত্যি। এসব ঘটনার জন্য ক্লাশ-কার্যক্রম অনেক সময় ব্যাহত হয়। যোগ্য ব্যক্তি তিরস্কৃত হন, অসুস্থ অনেক পরিবেশের জন্ম হয়, সবই ঠিক। কিন্তু এগুলো দুর করবার পথ কি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসনকে বাতিল করা এবং ৬০ দশকের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া? তাহলে কি নির্বাচিত সরকারের সময়ে যদি দলাদলি মারামারি সৃষ্টি হয় তাহলে প্রকৃষ্ট সমাধান হচ্ছে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়া? তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান তো এরকম সমাধানের কথাই বলেছেন।

বস্তুতঃ এসব চিত্র পাল্টে দিতে যে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষকেরাই পারেন তার প্রমাণও আছে অনেক। উপরের চিত্রগুলোর বিপরীত চিত্র শিক্ষক এবং উপাচার্যরাই স্থাপন করেছেন অনেকবার। উপাচার্য সরকারের অগণতান্ত্রিক নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শিক্ষার স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন, শিক্ষকরা সব প্রতিকূলতা, অভাব, রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংঘবদ্ধ হয়েছেন, এমন প্রমাণ অনেক আছে।

৬০ দশকে বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনে চলতো তাতে নির্বাচনের কোন বালাই ছিল না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় কর্মকান্ডে মোনেম খান আর তার দোসরদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য তখন এই কমিটি প্রধান কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু সে সময় কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে তা তার তো অজানা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভয়াবহ অপরাধীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, হত্যাকান্ড পরিচালনা, শিক্ষকদের উপর আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনা এই সময়েই শুরু হয়, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন স্বায়ত্তশাসন ছিল না। সে সময় উপাচার্যকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগদান করতেন, উপাচার্য ডীন, বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য নিযুক্ত করতেন, উপাচার্য তখন শিক্ষকদের মতামতের তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু তাকে সব সময় সালাম ঠুকতে হতো আমলাদের পায়ে, গভর্নরের জুতায়। এই উপাচার্যদের ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়েও চক্র ছিল-সুবিধাভোগী সুবিধা আকাংক্ষী। একই ঘটনা অধিকতর কদর্য চরিত্রে দেখা যেতো। ডীন, বিভাগীয় প্রধান ইচ্ছামত যা খুশি করতে পারতেন; কর্তা খুশি থাকলে যতদিন খুশি থাকতে পারতেন। তাদের এই ইচ্ছা এবং খুশির সমস্ত দায়ভার বহন করতে হতো সাধারণ শিক্ষকদের। যাদের কোন ভোট দেয়া তো দুরের কথা, কোন কথা বলার উপায় ছিল না। যোগ্য শিক্ষকরা কোণঠাসা হয়ে থাকতেন; আযোগ্যরা বাজার করে দিতেন 'বস'-কে, ফাইফরমাশ খেটে পদোন্নতি পেতেন।

এখনও বস হবার চেষ্টা কেউ কেউ করেন। কিন্তু তাকে বস হিসেবে না মানলে খুব বড় কোন ক্ষতি নেই, অন্ততঃ চাকুরী যাবার ভয় থাকে না এখনও প্রভুত্ব করবার চেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও হচ্ছে। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অসদাচরণ' ও 'অবাধ্যতা' দুর করবার নামে একটি আমলাতান্ত্রিক আইন পাশ করা হয়েছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পথও আছে। ৬০ দশকে এটা ছিল না। এই প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক শিক্ষক সেসময় নাজেহাল হয়েছেন। নাজেহাল এখনও হতে হয়-কিন্তু পরিস্থিতি যে ৬০ দশকের চাইতে উন্নততর এতে কোন সন্দেহ নেই।

শেষ পর্ব আগামীকাল

আনু মুহাম্মদ : প্রাবন্ধিক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

ব্যবস্থাধীনে উপাচার্য, ডীন এবং সিন্ডিকেট সদস্য হবার জন্যে আগ্রহী ব্যক্তিদের নির্বাচকমন্ডলীর কাছে যেতে হয়। তাদের ভোট কার পক্ষে যাবে, কে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন এ নিয়ে খুব সঙ্গত কারণেই শিক্ষকদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি বা বহুধাবিভক্তি সৃষ্টি হয়। এর কারণে সৃষ্টি হয় শিক্ষকদের গ্রুপ।

তিনি শুধু সিনেট দ্বারা নির্বাচিত হলেই হবে না, তার নিযুক্তির চূড়ান্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে। সুতরাং পুনরায় নির্বাচনের জন্যে একদিকে তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকমন্ডলী এবং অন্যদিকে সরকার দু'পক্ষকেই খুশি রাখতে হয়। সরকারের কাছ থেকে নিযুক্তি পাবার জন্যে ন্যাক্কারজনক ধরাধরির ঘটনাও খুব দুর্লভ নয়।